কাজী জহিরুল ইসলাম

জব্বার

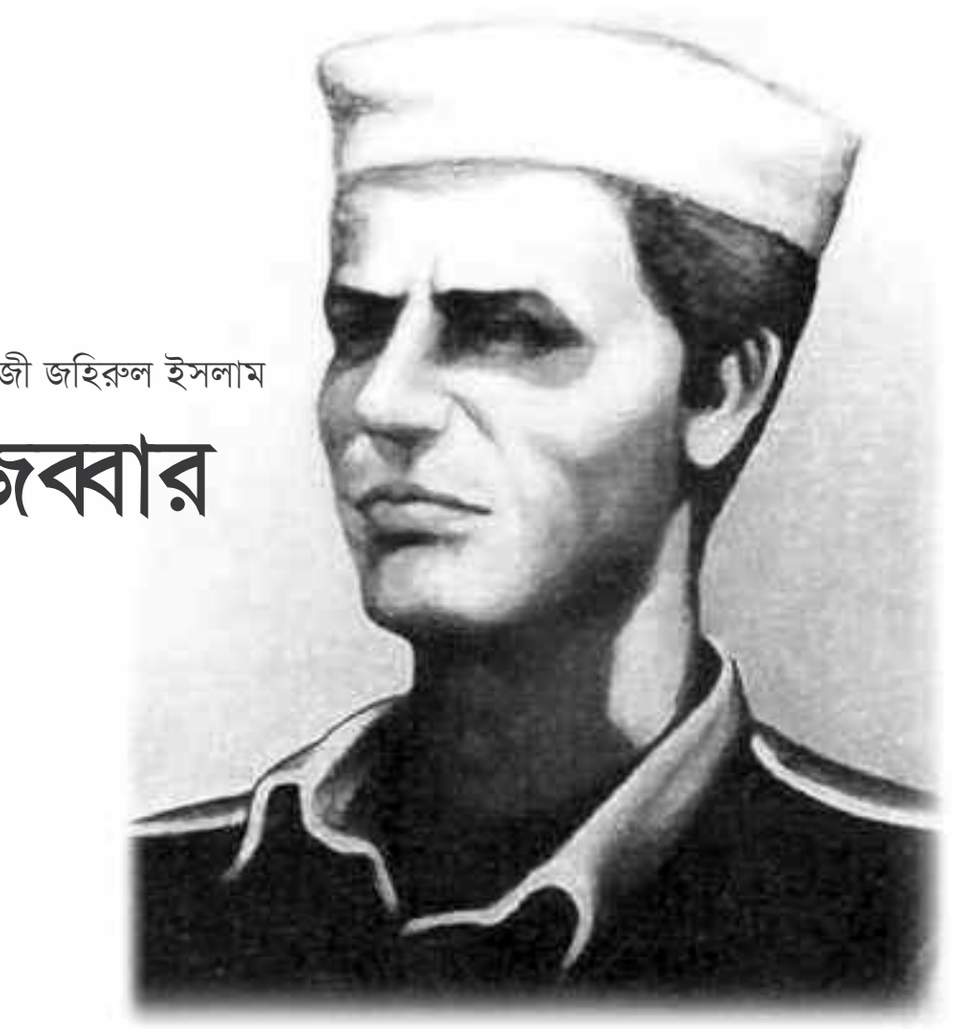

গল্প

পরনে লুঙ্গি, উদোম গা, মাথায় সাদাকালো চেক গামছা বাঁধা। যুবকের নাম রুপাই। তেলতেলে কালো গায়ের রঙ, খাড়া নাক, উজ্জ্বল দুটি চোখ। প্রাণ খোলা হাসিতে উদ্ভাসিত। তার সামনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট, ড. দীনেশ চন্দ্র সেনের সহযোগী, চৌকোনো মুখের এক যুবক, দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে নিজের লেখা কবিতা আবৃত্তি করছেন,

সখী দীন দুঃখীর যারে ছাড়া কেহ নাই
সেই আল্লার হাতে আজি আমি তোমারে সঁপিয়া যাই।
মাকড়ের আঁশে হস্তি যে বাঁধে, পাথর ভাসায় জলে
তোমারে আজিকে সঁপিয়া গেলাম তাঁহার চরণতলে।

কবির নাম জসীম উদদীন। ত্রিশ বছরের সুঠাম পুরুষ। নাওয়া খাওয়া বাদ দিয়ে সারাদিন গ্রামে গ্রামে হেঁটে বেড়ান আর বুড়ো-বুড়িদের সাথে কথা বলেন। দীনু বাবুর দেওয়া উপহার পার্কার কোম্পানির ঝর্ণাকলমটি তিনি যক্ষের ধনের মতো কোর্তার বুক পকেটে গুঁজে রাখেন আর একটু পরপর হাত দিয়ে দেখেন তা আছে কিনা। লোকজগান, ছড়া, শ্লোক যেখানে যা পান তা নোট খাতায় টুকে কাঁধের ঝোলার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখেন। শুধু যে লোকজ সাহিত্য সংগ্রহ করেন এবং লেখেন তাই না, হঠাৎ হঠাৎ কবিতার লাইন মনে এলে তাও হাঁটতে চলতেই লিখে ফেলেন। 'কবর' কবিতা লিখে তিনি এরই মধ্যে কলকাতা এবং ঢাকায় বিখ্যাত হয়ে গেছেন। এই গণ্ডগ্রামের অনেকেই সে-কথা জানে না। গত দুই সপ্তাহ ধরে রাওনা ইউনিয়ন চষে বেড়াচ্ছেন। হাঁটতে হাঁটতে জসীম উদদীন আর রুপাই এসে হাজির ধোপাঘাট কৃষিবাজার প্রাইমারি স্কুলে। প্রধান শিক্ষক হিমাংশু রায় বয়সের ভারে ন্যুব্জ, উদোম বুকের ওপর লেপ্টে থাকা পৈতেয় বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে ডান হাতের ভর পৈতের ওপর রেখে পিটপিট করে তাকান আগন্তুকের দিকে। মাস্টার মশাই প্রশ্ন করার আগেই রুপাই উত্তর দিয়ে দেয়।

-স্যারের নাম জুশিমুদ্দিন, কবি। এই গাঁও হেই গাঁও গুরে আর কবিতা লেকে। আমারে নিয়াও লেকছে।

এরপর রুপাই হিমাংশু রায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, 'ফাগলা কিসিমের, কিন্তু লুক বালা। আফনের লগে আলাপ করবার চায়'। হিমাংশু তাঁর কুঁজো হয়ে যাওয়া পিঠ কিছুটা সোজা করে উঁচু হয়ে জসীম উদদীনের চোখের দিকে তাকান। স্কুলের পরে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ক্লাস চলছে, অন্য ক্লাসের ছেলে-মেয়েরা ছুটি হওয়ায় বাড়ি চলে গেছে। বৃত্তির ক্লাস থেকে এক ছাত্র বেরিয়ে এসে স্কুলের উঠানে দাঁড়িয়ে থাকা আগন্তুককে গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখে। ছাত্রের নাম আবদুল জব্বার, বয়স তের বছর। তার পরনেও লুঙ্গি, গায়ে তাঁতের কোর্তা। জব্বারের পেছন পেছন ক্লাস থেকে, ষোল/সতেরজন ছাত্র আর দুজন ছাত্রী, একে একে সকলেই বেরিয়ে আসে। ছাত্রী দুজনের পরনে তাঁতের শাড়ি। পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী হলেও বয়ঃসন্ধির রহস্য ওদের শরীরে। ব্লাউজ ছাড়া বুকে সেই রহস্য উঁকি দিচ্ছে। জসীম উদদীন ভিড় ঠেলে মেয়ে দুটির

কাছে এগিয়ে যান। মেয়েরা লজ্জায় কিছুটা সঙ্কুচিত হয়ে পিছিয়ে গেলে তিনি নেচে নেচে কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করেন,

এইখানে তোর দাদীর কবর ডালিম গাছের তলে
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে
এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতন মুখ
পুতুলের বিয়ে ভেঙে যেত বলে কেঁদে ভাসাইত বুক

'কেঁদে ভাসাইত বুক' শব্দগুলি উচ্চারণ করার সময় তিনি নিজেও কেঁদে ফেলেন। মেয়ে দুজন তখন খিলখিল করে হাসে। জসীম উদদীন প্রথমে উঠানের ঢালে, যেখানে একটি লেবুগাছ আর যার পাশে একটি টিউবওয়েল, সেখানে তাকান, পরে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেন, হিমাংশু বাবু, বেজায় গরম পড়ছে। একটা গামলা আর লোটার ব্যবস্থা করেন, আমি এই লেবুগাছের তলে গোসল করুম। ছাত্রছাত্রীরা প্রধান শিক্ষকের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি সম্মতিসূচক মাথা নাড়তেই জব্বার কাজটির নেতৃত্ব নিয়ে নেয়। চারজন ছেলেকে নিয়ে সে ছুটতে থাকে স্কুলের পাশের জুলমত ব্যাপারীর বাড়িতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চারজন ধরাধরি করে একটি গামলা এনে কলতলায় রাখে। অন্য একটি ছেলের হাতে মাটির লোটা।

জসীম উদদীন গান গাইতে গাইতে লেবুতলায় গোসল করছেন। এই দৃশ্য দেখছে ধোপাঘাট প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক। এরই মধ্যে গ্রামের আরো বেশ কিছু উৎসাহী নারী-পুরুষ এসে জড়ো হয়েছে। এক বুড়োর হাতে নারকেলের হুক্কা। তিনি নারকেলের ফুটোয় চুমো দিতে দিতে আঁড়চোখে দেখছেন জসীম উদদীনকে। কলকাতা শহর থেকে আসা এক পাগলা কবির পাগলামি দেখছে গ্রামবাসী।

১৯৩৩ সালের আষাঢ় মাসে কোনো বৃষ্টি নেই। খাঁ খাঁ বিরানভূমি। পাঁচুয়া গ্রামের শেষ প্রান্তে একটি শুকনো খাল। খালের ওপর সদ্য ফেলে যাওয়া গৃহস্থের মরা গরু। গরুটিকে ঘিরে আছে একদল শকুন। কারো অপেক্ষায় আছে ওরা। তখন আকাশ থেকে বাউলি কেটে নেমে আসে একটি গৃধিনী। সে এসে ঠোকর দিয়ে মৃত গরুটির ডান চোখ বের করে আনে। এরপর অন্য শকুনগুলো গরুটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মানুষ পুরুষশাসিত হলেও শকুনেরা বোধহয় নারী শাসিত। গৃধিনী না ছুঁয়ে দিলে শকুন সম্প্রদায় মরা ছোঁয় না। এরই মধ্যে বেশকিছু শেয়াল এসে জুটেছে। মরা গরুর খালের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে গফরগাঁওয়ের গৃহস্থ-মজুর খরাজনিতসমূহ দুঃখদিনের কথা বলে আর আহাজারি করে।

হাসান আলী ডুমুর গাছে মাথা ঠেকিয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছেন। ওর মাথার ওপর দাঁড়কাকের দল খা খা করে ডাকছে।

-আর কি খাইতি, আর কি খাইতি রাইক্কসের দল। আমার সব ঐদ্দো শেষ।

কথাগুলো বিলাপ করে বলতে বলতে স্বামীর পিঠে হাত বুলাচ্ছেন সাফাতুন নেছা। একটু দূরে আম গাছের গুঁড়ির ওপর বসে আছে জব্বার। দুই পাশে মটখিলার ডাল। সে মট মট করে মটখিলার ডাল ভেঙে ছোট ছোট টুকরো করে ছুড়ে মারছে উঠানের ওপর।

-আব্বা, আমি আর ফর্তাম না। অক্কন তাইক্কা খেতো মুনি দিয়াম।

পুত্রের কথায় হাসান আলীর কান্নায় ছন্দপতন ঘটে। সংসারের প্রতি ছেলের দরদ মৃত গাভীর শোক ভোলাতে কিছুটা হলেও সাহায্য করে। হাসান আলি পুত্রের কাছে এগিয়ে আসে। দুই বাপ-বেটা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ চিৎকার করে কেঁদে স্বাভাবিক হয়।

এক বছর কৃষিজমিতে কাজ করে জব্বার বুঝতে পারে এই খরাকালে কৃষিজমি ওদের তেমন কিছুই দিতে পারবে না। এক ভোরে কাউকে কিছু না বলে সে ছুটে যায় গফরগাঁও স্টেশনে। বাহাদুরাবাদ ঘাট থেকে ঢাকাগামী ট্রেন এসে থামে গফরগাঁও স্টেশনে। লাফ দিয়ে তাতে উঠে পড়ে জব্বার। যাত্রীরা সবাই ভয়ে জড়োসড়ো। গফরগাঁও স্টেশনকে সবাই ভয় পায়। এটা ডাকাতের স্টেশন। এই স্টেশনে ডাকাতি হবেই। কয়েকজন যুবকের হাতে পাটের সুতলি দিয়ে বাঁধা চারটি করে বেশ কয়েকগাছি গোল গোল কালো বেগুন। ট্রেন থেমে আছে। যুবকদের গায়ের রঙ কুচকুচে কালো, উস্কোখুস্কো চুল, চোখ লাল, প্রত্যেকের চেহারা প্রায় একই রকম, রোগা, হ্যাংলা-পাতলা শরীর। ওরা যাত্রীদের কাছে গিয়ে গিয়ে বলছে, 'বেগুন, গফরগাঁওয়ের বেগুন। আলি এক আনা, গফরগাঁওয়ের বেগুন'। কেউ কেউ এক আনা দিয়ে চারটি বেগুন কিনছে, অনেকেই লাগবে না বলে বিদেয় করে দিচ্ছে। এরই মধ্যে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। যুবকেরা সবাই হাতের বেগুন ট্রেনের ফ্লোরে ফেলে দিয়ে কোমর থেকে ডেগার বের করে; চোখের রঙ পাল্টিয়ে, হাতের পেশী ফুলিয়ে, তাকায় যাত্রীদের দিকে। ওদেরই একজন বেশ আস্তে কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বলে, 'কেঅই লড়েন না যে। লড়েন যদি তো মাইরালবাম, অক্করে কুইট্ট্যালবাম'। যাত্রীদের মধ্যে একটা ভয়ের শোরগোল ওঠে। তখন দলনেতা গলা চড়িয়ে একটা ধমক দেয়। সাথে সাথে সবাই চুপ। 'রেলগাড়ি ঝমাঝম, পা পিছলে আলুর দম' ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। কোমরে ঝোলানো যে চটের ব্যাগটিতে বেগুন বিক্রি করা পয়সা নিচ্ছিল, সেই ব্যাগটি নিয়ে এখন এক ডাকাত সব যাত্রীর কাছে যাচ্ছে। যাত্রীরা ভয়ে তাদের সোনা-দানা দেহ থেকে খুলে ব্যাগের মধ্যে রাখছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাজ শেষ করে ডাকাতের দলটি চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে যায়। সব শেষে দলনেতা লাফিয়ে পড়ার আগে যাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলে, 'সোনা-দানার কুনু দাম নাই বুজ্জুইন, জানডাঐ আসল, জান বাছলে সোনা-দানা ঐবো।' বলেই সে ট্রেনের বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ট্রেনের বাইরে থেকে একটি চিৎকার শোনা যায়। দুজন পুরুষ যাত্রী জানালা দিয়ে গলা বের করে দেখার চেষ্টা করে। 'সম্ভবত ডাকাত সর্দার

এক ভোরে কাউকে কিছু না বলে সে ছুটে যায় গফরগাঁও স্টেশনে। বাহাদুরাবাদ ঘাট থেকে ঢাকাগামী ট্রেন এসে থামে গফরগাঁও স্টেশনে। লাফ দিয়ে তাতে উঠে পড়ে জব্বার। যাত্রীরা সবাই ভয়ে জড়োসড়ো। গফরগাঁও স্টেশনকে সবাই ভয় পায়। এটা ডাকাতের স্টেশন। এই স্টেশনে ডাকাতি হবেই। কয়েকজন যুবকের হাতে পাটের সুতলি দিয়ে বাঁধা চারটি করে বেশ কয়েকগাছি গোল গোল কালো বেগুন। ট্রেন থেমে আছে। যুবকদের গায়ের রঙ কুচকুচে কালো, উস্কোখুস্কো চুল, চোখ লাল, প্রত্যেকের চেহারা প্রায় একই রকম, রোগা, হ্যাংলা-পাতলা শরীর। ওরা যাত্রীদের কাছে গিয়ে গিয়ে বলছে, 'বেগুন, গফরগাঁওয়ের বেগুন। আলি এক আনা, গফরগাঁওয়ের বেগুন'। কেউ কেউ এক আনা দিয়ে চারটি বেগুন কিনছে, অনেকেই লাগবে না বলে বিদেয় করে দিচ্ছে। এরই মধ্যে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে

সিগন্যাল পোস্টে বাড়ি খেয়ে মারা গেছে।' তখন ট্রেনের ভেতরে মরাকান্নার শোরগোলটি থেমে যায়। মহিলারা কোরাসের মত বলে, উচিত শিক্ষা হৈছে।

সম্পদ হারা মানুষের কান্না আর 'আল্লাহর বিচার আল্লায় করছে' টাইপের আলোচনা শুনতে শুনতে জব্বার ঢাকার ফুলবাড়িয়া স্টেশনে এসে নামে। দুদিন ফুলবাড়িয়া স্টেশনে কাটিয়ে তেমন সুবিধা করতে না পেরে আরেক ট্রেনে চড়ে নারায়ণগঞ্জে চলে আসে।

তাম্বুলরসে ঠোঁট লাল করা তিন তরুণীর খোলা চুল উড়ছে শীতলক্ষ্যার হাওয়ায়। কুড়ির আশপাশে বয়স, হাতাকাটা ব্লাউজের ওপর কোনো রকমে পেঁচানো ক্যারোলিনের শাড়ি। মুখের ওপর পাউডারের সঘন প্রলেপ কারো হাতের, ঠোঁটের, দেহের স্পর্শে ফিকে হয়ে এসেছে। ফুলের নামে ওদের নাম, বেলী, জুঁই, বকুল। কিন্তু ওরা ঝরা ফুল এবং বহুল ব্যবহারে মলিন। অন্য দুজনের চেয়ে জুঁই একটু লম্বা এবং অধিক রূপবতি। ওরা যে কাজ করে এই কাজে রূপেরই কদর বেশি, তাই রূপের দেমাগ জুঁই একটু দেখাতেই পারে। বকুল এবং বেলির এতে কোনো মনস্তাপ নেই, জুঁই ওদের অলিখিত দলনেতা। শীতলক্ষ্যা থেকে উঠে আসা ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়ায় ওদের নির্ঘুম, ক্লান্ত দেহে আরাম অনুভব করে। জুঁইয়ের হাতে এখন একটি অদ্ভুত বস্তু। বস্তুটি তিন ইঞ্চি লম্বা, কলমের চেয়ে একটু মোটা। কাল রাতে জেমস সাহেব ওকে এটি উপহার দিয়েছেন। বকুল এবং বেলী গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছে বস্তুটিকে। বকুল প্রশ্ন করে,

- এইডার নাম জানছ দিদি?

- জেমস সাবের ছোডো মিয়া। হিঁ হিঁ হিঁ।

বেলী রসিকতা করে। জুঁই ওর দিকে কটমট করে তাকায়। মাত্র এক মুহূর্তের জন্য, পরক্ষণেই বেলীর চেয়ে তিনগুণ জোরে শব্দ করে হাসতে শুরু করে জুঁই। ওরা হাসতে হাসতে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে।

ধুরো মাগি। জেমস সাবের ছোডো মিয়া এতো ছোডো না।

বকুল বলে, হেইডা ছোডো ঐলেও মনডা বড় আছে জেমস সাবের।

অনেক কষ্টে বস্তুটির নাম মনে করে জুঁই, লেবিশটিক। অন্য দুজন বার তিনেক চেষ্টা করে উচ্চারণ করে, লেবিশটিক। এরপর যেন ম্যাজিক দেখাচ্ছে, এমন ভঙ্গিতে গোড়ার রিংটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খোলসের ভেতর থেকে লাল একটি দণ্ড বের করে জুঁই। এই দৃশ্য দেখে বেলী এবং বকুল অবাক হয় এবং যখন ওদের অবাক হওয়ার রেশ কেটে যায়, অশ্লীল রসিকতায় ওরা হাসতে হাসতে একে অন্যের ওপর ঢলে পড়ে।

জুঁই নিজের ঠোঁটে লাল দণ্ডটি ঘষতে শুরু করলে বেলী এবং বকুল লাজুক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। যখন জুঁই তাম্বুলরস বা পুঁইগোটার রঙ ছাড়াই টসটসে লাল ঠোঁট নিয়ে ওদের দিকে তাকায় তখন অন্য দুজন ছোঁ মেরে ওর হাত থেকে লিপস্টিকের দণ্ডটি নিয়ে পালাক্রমে নিজেদের ঠোঁট রাঙায়।

নারায়ণগঞ্জ বন্দরের ডেপুটি ডিরেক্টর বিলেতি নাগরিক জেমস মার্টিন ১৯৩৫ সালে এদেশে প্রথম একটি লিপস্টিক আনেন এবং তা উপহার দেন একজন পতিতাকে। ফরাসি গেরলা কোম্পানির লিপস্টিক ক্রমশ এদেশের উচ্চবিত্তের বঙ্গ ললনাদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

জাহাজঘাটের পন্টুন দুলে ওঠে যখন এক পলায়নপর কিশোরের পেছন পেছন তিন/চারজন মানুষের একটি দল ছুটতে ছুটতে পন্টুনে এসে ওঠে। ওদের পেছনে দুটি পথকুকুর ছুটতে ছুটতে ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে। পন্টুনের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে কিশোর। ভয়ার্ত চোখে সে চেয়ে আছে দলটির দিকে। 'এইবার সোনাধন, কই যাইবা', বলেই ভিড়ের একজন ছুটে গিয়ে ওকে কষে একটা লাথি মারে। ভারসাম্য ঠিক রাখতে না পেরে কিশোর ঝপাৎ করে পড়ে যায় শীতলক্ষ্যার বুকে। ভিড়টি তখন আস্তে আস্তে মিইয়ে যায়। ভোরের সূর্য ততক্ষণে শীতলক্ষ্যার বুকে আগুন ছড়িয়ে দিয়েছে। দূরে, নদীর পাড়ে, হিন্দু নারীরা স্নান সেরে, বুক পানিতে দাঁড়িয়ে, সূর্যপ্রণাম করছে। এতোক্ষণ ছোটাছুটির এই দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল তিন তরুণী। লোকগুলো চলে গেলে ওরা একটি দড়ি জোগাড় করে এনে নিচে ফেলে, দড়ি বেয়ে উঠে আসে কিশোর।

মেয়েরা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একসাথে হাজারটা প্রশ্ন করে। কিশোর কারো কথার জবাব না দিয়ে পন্টুনের ওপর লুটিয়ে পড়ে।

যখন ওর জ্ঞান ফিরে আসে তখন সে একটি টিনশেড দালানঘরের চৌকির ওপর। ওর পরনে শুকনো লুঙ্গি, গায়ে ভাঁজ করে জড়িয়ে দেওয়া কমলা রঙের একটি সুতি-শাড়ি। ঘরে পর্যাপ্ত আলো না থাকলেও সে দেখতে পায় ওর মুখের ওপর ঝুকে আছে এক অপরূপা নারী। এমন সুন্দর নারী সে এর আগে আর কোনোদিন দেখে নাই। পরী।

- নাম কি?

- জব্বার

- বাড়ি?

- গফরগাঁও

- ওরেব্বাপ, ডাহাইতের দেশের মানুষ। তো ডাহাইতের দেশের মানুষ ডাহাতি করবা, চুরি করছ কেড়ে?

- তিনদিন কিচ্ছু খাইছিনা। হুডেলের খোলাইত্তাইক্কা একটা লুডি লৈয়া দৌড় মারছিলাম।

- উডো। ভাত খাও। ডিম ভাজা আর ভাত। কাঁচামরিচ খাইবা?

- হ।

- খাইয়া শৈল্লে বল কর, একজনের কাছে নিয়া যামু তোমারে। কাম পাইবা।

খেতে খেতে জব্বার তাকায় জুঁইয়ের দিকে।

- আপনের নাম কি?

- জুঁই

- ফুলের নাম, না?

- হ

- আপনে ফুলের থিকা সুন্দর।

জুঁই তখন ওর গাল টিপে দিয়ে বলে,

- হ, হৈছে। আমার লগে পিরিত চুদান লাগবো না। খাইয়া হুইয়া পড়ো। গতর ঠিক করো। সন্ধ্যায় লৈয়া যামু। বিলাতি সাব। বন্দরের বড় সাব। কাম একটা পাইবাআই। কাম করবা তো, নাকি আবার গফরগাঁও যাইবা গা ডাহাতি করনের লেইগা?

- কামের লাইগ্যাঐদ্দো নারানগঞ্জো আইছি। দেশো খরানি লাগজে। জমিন ফুইড়া সাফ। কুনু ফসল নাই।

- দেশে কেডায় আছে?

- বেহেঐ আছে। বাপ, মা, চাইর ভাই আর দুই বৈন।

- ঐছে, অহন হাত ধুইয়া হুইয়া পড়ো। আমারও ঘুম পাইছে।

- আমি কৈ হুতবাম?

- কে, চকিত হুইবা।

- আফনে?

- আমিও চকিত হুমু, অসুবিধা আছে?

জব্বার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। জুঁই তীক্ষ্ণ চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে প্রশ্নের উত্তর শোনার জন্য। জব্বার এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ে।

- আফনে পরীর লাহান সুন্দর। আফেনেরে পরী বু ডাকতাম?

- খবরদার, বুবু টুবু ডাকবি না আমারে। আমি কেঐর বুবু না। আমি খানকি। আমি মানুষ না, বুজছস ছ্যামড়া?

এরপর উল্টো দিকে ঘুরে জুঁই কাঁদতে শুরু করে। সেই কান্নায় কোনো শব্দ নেই, গর্জনহীন নদীতে শুধু স্রোতধারা আছে।

১৫ বছর বয়সে জব্বার নারায়ণগঞ্জ বন্দরের ডেপুটি ডিরেক্টর জেমস মার্টিনের টি-বয়ের চাকরি পায়। এক বছর জেমস সাহেবের সাথে কাজ করে মেধাবী জব্বার বেশ কিছু ইংরেজি বাক্য শিখে ফেলে। জেমস সাহেব ওর কাজে মুগ্ধ হয়ে ওকে রেঙ্গুন বন্দরে ম্যাসেঞ্জারের চাকরি দিয়ে পাঠান।

২০১০-এর জুলাই মাস। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির ভেতর দিয়ে একটি মাইক্রোবাস ঢাকা থেকে ছুটে চলেছে গফরগাঁওয়ের দিকে। গফরগাঁও থানা কমপ্লেক্সে এসে মাইক্রোবাস থামে দুপুর বারোটায়। তখনো বৃষ্টি হচ্ছে। ওসি সাহেবের নাম মকবুল। তিনি সিভিল পোশাকে আছেন। ছাতা নিয়ে নিজেই এগিয়ে এসে জাতিসংঘের একজন কর্মকর্তাকে রিসিভ করেন। লোকটিকে দেখে ওসির তেমন পছন্দ হয় না। বড় বড় গোঁফ, কাঁচা-পাকা দাঁড়ি, উস্কো-খুস্কো চুল, কণ্ঠে তেমন ভারিক্কি নেই। ওসি সাহেব ভেবেছিলেন জাতিসংঘের একজন আন্তর্জাতিক কর্মকর্তা, চালচলনে একটা অন্যরকম ব্যাপার থাকবে। লোকটাকে দেখলে মনে হয় দুই টাকা দামের কবি। ভদ্রলোক কবিতা লেখেন বলেও শুনেছেন।

স্যার, ডিআইজি বাহার স্যার আপনার সম্পর্কে আমাকে সব বলেছেন।

আপনার পছন্দমত লাঞ্চের ব্যবস্থা তৈরি আছে, বাহার স্যারের নির্দেশমত ছোট মাছ আর শাক-শব্জির ব্যবস্থা। খেয়েই বেরিয়ে পড়ব।
দুই টাকা দামের কবির নাম কাজী জহিরুল ইসলাম। তিনি ওসির ছাতার নিচে মাথা রেখে থানার ভেতরে প্রবেশ করেন।
- আপনাকে যেতে হবে না। আমার গাড়ি নিয়েই যাব। সাথে একজন লোক দেবেন যে আমাদের পথ দেখাতে পারবে। এলাকাটা ঘুরে দেখতে চাই।
- স্যার, এলাকা বেশি সুবিধার না। বিদেশ থেকে আসছেন এটা জানাজানি হয়ে গেলে কিছু ঘটে যেতে পারে।
- কিছু ঘটে গেলে আপনাকে ফোন দেব। সিনেমার শেষ দৃশ্যের মতো আপনি ফোর্স নিয়ে হাজির হবেন।
রসিকতাটা তেমন ভালো লাগে না ওসি মকবুলের।
- স্যার কি পাঁচুয়া গ্রামে যাবেন?
- হ্যাঁ, সেটাই তো প্লান।
- স্যারের জন্য একটা সুখবর আছে। শহিদ জব্বারের স্ত্রী আমেনা খাতুন এখন উপজেলা শহরেই আছেন। তাঁর ছেলে নুরুল ইসলাম বাদল সাহেবও আছেন। আত্মীয়ের বাড়িতে উঠেছেন।
- এইসব ব্যবস্থা কি আপনি করেছেন?
খাওয়া থামিয়ে জহির তাকায় ওসির চোখের দিকে। ওসি কিছুটা বিব্রতবোধ করে এবং তখনই টের পায় দুই টাকা দামের কবিকে যতটা হালকা ভেবেছিলেন লোকটা ততটা হালকা না। দৃষ্টি বেশ তীক্ষ্ণ এবং পাওয়ারফুল। মানুষের ক্ষমতা যে চোখে থাকে এই শিক্ষা ওসি অনেক আগেই পেয়েছেন আউয়াইল্যা ডাকাতকে ধরতে গিয়ে। দ্বিতীয়বার আউয়াল খুব কাছে থেকে এমনভাবে চোখের দিকে তাকিয়েছিল যে গুলি করার কথাই ভুলে যায় মকবুল। হাতে-নাতে ধরার সুযোগটা হাত ছাড়া হয়ে গেল। পরে অবশ্য মকবুলই তাকে ধরে। এজন্য পিপিএম পদকও পেয়েছে।
- স্যার, জব্বারের এলাকা দেখতে এসেছেন, তাঁর স্ত্রীর সাথে, ছেলের সাথে কথা না বললে কি ষোলকলা পূর্ণ হয়? তাই তাদেরকেও ঢাকা থেকে আসার অনুরোধ করেছি। তিনারা অতিশয় ভালো মানুষ, অনুরোধ রেখেছেন।
- হুঁম, আপনি খুব কাজের মানুষ। পাঁচুয়া অব্দি যেতে পারবো তো? পাঁচুয়া গ্রামটাও আমি দেখতে চাই।
ওসি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, বৃষ্টিতে রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ। গাড়ি যাবে না।
তাহলে হেঁটে যাবো। অনেক দিন কাদা-পানিতে হাঁটা হয় না।
দ্বিতীয়বারের মতো ভদ্রলোকের চারিত্রিক দৃঢ়তা টের পায় ওসি মকবুল। তিনতলা একটি বাড়ি। লাল রঙ করা লোহার গেট আর বাইরের দেয়ালের নীল রঙ দেখে বাড়িটির গ্রাম্যতা টের পাওয়া যায়। আমেনা বেগমের বয়স ৭৬ বছর। ১২ বছর পর জব্বার রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে নারায়ণগঞ্জের পথে পথে একটি নারীকে দিনের পর দিন খুঁজেছে। তারপর একদিন পাঁচুয়ায় ফিরে এসে বন্ধুর বোন আমেনা খাতুনকে বিয়ে করে। মাটিতে পা ঝুলিয়ে বিছানার ওপর মায়ের পাশে বসে আছেন মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম বাদল। তিনি গলা চড়িয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। আমার পিতা বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু প্রশাসনের অবহেলার কারণে তাঁর জন্য সরকার যা কিছু করেছে সব নষ্ট হতে বসেছে। 'ভাষা শহীদ আবদুল জব্বার স্মৃতি জাদুঘর ও গ্রন্থাগার' - এ আজ পর্যন্ত কোনো স্টাফ নিয়োগ দেওয়া হয় নাই। পাঁচুয়া গ্রামের নাম বদল করে জব্বারনগর করা হলেও আজ পর্যন্ত গেজেট নোটিফিকেশন হয় নাই। একজন ভাষা শহীদের প্রতি এটা চরম অবহেলা, এই অবহেলা জাতি কিছুতেই মেনে নেবে না।
বাদল সাহেব। আমি আপনার ক্ষোভের কারণটা বুঝতে পেরেছি। আমি তো সরকার বা প্রশাসনের কেউ না। তবু আমি এ বিষয়ে প্রশাসনের সাথে কথা বলার চেষ্টা করব। আপনি যদি কিছু মনে না করেন আমি কি আপনার আম্মার সাথে কিছুক্ষণ একা কথা বলতে পারি?
জহির তার ডিক্টাফোন অন করে আমেনা খাতুনকে প্রশ্ন করেন
- আবদুল জব্বারের সাথে আপনার সংসার তো খুব অল্প সময়ের?
- সংসার আর করতে পারলাম কৈ বাবা। বিয়ার পরের বছর এই ফুলা ঐলো। এর এক বছরের মাঝেই সব শেষ। আমার মাও বাঁচলো না আর

জাহাজঘাটের পন্টুন দুলে ওঠে যখন এক পলায়নপর কিশোরের পেছন পেছন তিন/চারজন মানুষের একটি দল ছুটতে ছুটতে পন্টুনে এসে ওঠে। ওদের পেছনে দুটি পথকুকুর ছুটতে ছুটতে ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে। পন্টুনের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে কিশোর। ভয়ার্ত চোখে সে চেয়ে আছে দলটির দিকে। 'এইবার সোনাধন, কই যাইবা', বলেই ভিড়ের একজন ছুটে গিয়ে ওকে কষে একটা লাথি মারে। ভারসাম্য ঠিক রাখতে না পেরে কিশোর ঝপাৎ করে পড়ে যায় শীতলক্ষ্যার বুকে। ভিড়টি তখন আস্তে আস্তে মিইয়ে যায়। ভোরের সূর্য ততক্ষণে শীতলক্ষ্যার বুকে আগুন ছড়িয়ে দিয়েছে। দূরে, নদীর পাড়ে, হিন্দু নারীরা স্নান সেরে, বুক পানিতে দাঁড়িয়ে, সূর্যপ্রণাম করছে। এতোক্ষণ ছোটাছুটির এই দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল তিন তরুণী। লোকগুলো চলে গেলে ওরা একটি দড়ি জোগাড় করে এনে নিচে ফেলে, দড়ি বেয়ে উঠে আসে কিশোর

তারেও আরাইলাম।
- মা-ও বাঁচলো না, এই কথার অর্থ কি?
- আমার অসুইক্কা আম্মারে লৈয়াঐদ্দো তে ঢাহাত যায়।
- কি হয়েছিল আপনার মায়ের?
- তহন দো কিছুই জানছি না। ফরে জানছি ক্যান্সার ঐছিলো।
- যখন আবদুল জব্বার পুলিশের গুলিতে মারা যান, আপনি তখন কোথায় ছিলেন?
- আমি গেরামেঐ আছলাম বাবা। ছুড় আবু না আমার কুলো।
- তখন আপনার বয়স কত?
- কত ঐবো, ১৬/১৭ বছর।
- এরপর আপনি আবার বিয়ে করেন?
- তাঁর ছুট বাই আবদুল কাদেরের লগে আমার শ্বশুর-শ্বাশুড়িঐ বিয়া দেয়।
- আর কোনো সন্তান?
- হ, ঐছে না, আল্লার মাল তিনজন। রফিকুল্লাহ, আতিকুল্লাহ আর রাশেদা খাতুন।
বৃষ্টির তোর আরো বাড়তে থাকে। রাস্তাঘাট ভেসে যায়। কাদা-পানিতে হেঁটেও যাওয়ার অবস্থা না থাকায় পাঁচুয়া গ্রামে যাওয়ার পরিকল্পনা বাদ দিয়ে ঢাকায় চলে আসে জহির।

বার্মার উত্তরাংশের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার জন্য তিনটি ব্রিজ উড়িয়ে দেয় জাপানি সৈনিকেরা। রেঙ্গুন পুরোপুরি জাপানিদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। জব্বার এখন পূর্ণ যুবক। রেঙ্গুন বন্দরে যত পূর্ববাংলার শ্রমিক আছে তাদের অলিখিত নেতা। মুহুর্মুহু শেল আর বন্দুকের গোলাগুলির মধ্যে বাঙালি শ্রমিকেরা একত্রিত হয়ে নিজেদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছে। বন্দরের স্বাভাবিক কাজ-কর্ম বন্ধ। ব্রিটিশরা সরে পড়েছে। করলে তো অনেক কাজই আছে কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক কোনো চাকরি নেই, বেতন নেই। ওরা সিদ্ধান্ত নেয়, পূর্ববাংলায় ফিরে যাবে। ব্রিটিশ হটিয়ে ভারত স্বাধীন করতে পারলে দেশে কাজের অভাব হবে না।

রেঙ্গুন থেকে চট্টগ্রামের বা কলকাতার জাহাজ চলাচল বন্ধ। বাঙালি শ্রমিকদের একটি দল সিদ্ধান্ত নেয়, যে করেই হোক দেশে পৌঁছাতেই হবে। কখনো হেঁটে, কখনো নৌকায়, কখনো পাহাড়, কখনো অরণ্য পার হয়ে দীর্ঘদিন, দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ওরা ঢাকায় এসে পৌঁছায় ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে। ততদিনে ইংরেজ তাড়িয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। জব্বার পেয়েছে স্বাধীন পাকিস্তান। ঢাকার মাটিতে পা রেখে বাবার জন্য নয়, মায়ের জন্য নয়, ভাই-বোনের জন্য নয়, জব্বার অস্থির হয়ে ওঠে অন্য এক নারীর জন্য। সেই নারীর নাম জুঁই। সে ছুটে যায় নারায়ণগঞ্জ বন্দরে। কোথায় জেমস সাহেব, কোথায় জুঁই, বকুল, বেলী। এ-এক অন্য নগর। এক অচেনা শহর। এ-পথ, ও-পথ, এ-পাড়া, ও-পাড়া খুঁজে ব্যর্থ, বিধ্বস্ত হয়ে ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে ক্লান্ত জব্বার ফিরে আসে মাতৃভূমিতে, পাঁচুয়ায়, স্বজনদের কাছে।

১৯৯২ সালের মার্চ মাস। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ইস্ফেন্দিয়ার জাহেদ হাসান মিলনায়তনে বক্তৃতা করছেন সাংবাদিক, ভাষাসৈনিক এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের চরমপত্র পাঠক এম, আর, আখতার মুকুল। অনুষ্ঠানের আয়োজক শতাব্দী সাংস্কৃতিক সংসদ। সভাপতিত্ব করছেন চলচ্চিত্র প্রযোজক আব্বাস উল্লাহ শিকদার। তাঁর বক্তৃতার প্রায় পুরোটাজুড়েই চরমপত্র, 'কী পোলারে বাঘে খাইলো? শ্যাষ। আইজ থাইক্যা বঙ্গাল মুলুকে মছুয়াগো রাজত্ব শ্যাষ। ঠাস কইরা একটা আওয়াজ হইলো। কী হইলো? কী হইলো? ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে পিঁয়াজি সা'বে চেয়ার থনে চিত্তর হইয়া পইড়া গেছিলো। আট হাজার আটশ চুরাশি দিন আগে ১৯৪৭ সালের ১৪ ই আগস্ট মুছলমান-মুছলমান ভাই-ভাই কইয়া, করাচি-লাহুর-পিন্ডির মছুয়া মহারাজরা বঙ্গাল মুলুকে যে রাজত্ব কায়েম করছিলো, আইজ তার খতম তারাবি হইয়া গেলো।

বাঙালি পোলাপান বিচ্ছুরা দুইশ পঁয়ষট্টি দিন ধইরা বঙ্গাল মুলুকের ক্যাদো আর প্যাঁকের মাইদ্দে ওয়ার্ল্ড-এর বেস্ট পাইটিং ফোর্সগো পাইয়া, আরে বাড়িরে বাড়ি! ভোমা ভোমা সাইজের মছুয়াগুলা ঘঁত্ ঘঁত্ কইরা দম ফ্যালাইলো। ইরাবতীতে জনম যার ইছামতীতে মরণ। আতকা আমাগো চকবাজারের ছক্কু মিয়া ফাল পাইড়্যা উডলো, ভাইসা'ব, আমাগো চকবাজারের চৌরাস্তার মাইদ্দে পাত্থর দিয়া একটা সাইনবোর্ড বানামু। হেইডার মাইদ্দে কাউলারে দিয়া লেখাইয়া লমু, ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বঙ্গাল মুলুকে মছুয়া নামে এক কিছিমের মাল আছিলো। হেগো চোটপাট বাইড়া যাওনের গতিকে হাজারে হাজার বাঙালি বিচ্ছু হেগো চুটিয়া-মানে কি না পিঁপড়ার মতো ডইল্যা শেষ করছিলো। এই কিছিমের গেনজামরেই কেতাবের মাইদ্দে লিইখ্যা থুইছে পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে। টিক্কা-মালেক্যা গেলো তল, পিঁয়াজি বলে কত জল?'

বক্তৃতা শেষ হলে মুকুল মঞ্চ থেকে নেমে আসেন। অনুষ্ঠানের অন্যতম আয়োজক এক শুকনা-পাতলা সুদর্শন তরুণ তার বড় বড় চুল দুলিয়ে মুকুলের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। মুকুল এক গাল হাসি দিয়ে তাঁর সাথে হ্যান্ডশেখ করেন।

- আপনার কণ্ঠে চরমপত্র শুনলে ইচ্ছে হয় মুক্তিযুদ্ধে যাই।
- এই ইন্সপিরেশনটাই তো ছিল মিয়া।
- আপনি তো ভাষাসৈনিকও, ভাষা আন্দোলনের কথা আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই।
- এইটা মার্চ মাস অহন মুক্তিযুদ্ধের কথা শোনো, আবার ফেব্রুয়ারি আইলে ভাষা আন্দোলনের কথা শোনামু। সাগর পাবলিশার্সে আহো, আড্ডা দিমুনে।

এক বিকেলে বেইলি রোডের সাগর পাবলিশার্সে গিয়ে হাজির হয় সেই তরুণ। তখন বিকেল। বেইলি রোডে নাট্যকর্মী ও নাট্যপ্রেমীদের মুখর পদচারণা। তরুণ একটি পত্রিকার সাংস্কৃতিক প্রতিবেদক হওয়ায় এই জগতের অনেকেই তাঁকে চেনে, এদিক-সেদিক থেকে জহির, জহির ভাই, ওই মিয়া, জাতীয় আহ্বান ভেসে আসছে। জহির এসব অর্থহীন ডাকাডাকিকে পেছনে ফেলে ঢুকে পড়ে সাগর পাবলিশার্সে।

- আহো মিয়া, আহো।
- কেমন আছেন মুকুল ভাই।
- কোমরের ব্যথাটা বাড়ছে। ইন্টারভিউ নিবা?
- নিবো?
- না, না, অহন ইন্টারভিউ দিমু না। এমনিই আড্ডা দেই।
- ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনাটা বলেন, আপনি তো ঘটনাস্থলেই ছিলেন।
- ছিলাম মানে কী? ঘটনাটা তো আমরাই ঘটাইলাম। রাজনৈতিক নেতারা বলতে গেলে ভাষা আন্দোলন ব্যর্থই করে দিচ্ছিল। নবাবপুর রোডে আওয়ামী মুসলিম লীগের অফিসে ২০ তারিখ রাতে আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের যে মিটিং হয়, সেখানে সিদ্ধান্ত হয় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা যাবে না। এই কাপুরুষোচিত খবরটি আমরা পাই রাত দশটায়। আমি তখন ফজলুল হক হলে। আমরা গুটিকয় ছাত্র জেদ ধরলাম ১৪৪ ধারা ভাঙবোই। সর্বদলীয় কর্মপরিষদের সদস্য নয় এমন কিছু ছাত্রনেতাকে খবর দেওয়া হল। রাত ১২টায় ঢাকা হলের

> ১৪৪ ধারা ভাঙছে ছাত্রজনতা। হাজার হাজার মানুষ এসে জড়ো হয়েছে। জব্বার ছুটে এসে মিছিলের মধ্যে ঢুকে যায়। ওর হাতে প্ল্যাকার্ড। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে, একটি শেল এসে লাগে কালো, পাতলা, বড় বড় চোখ, এক ছাত্রনেতার গায়ে। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে যায় ক'জন ছাত্র। উপুর্যপরি টিয়ারশেল আর বন্দুকের গুলিতে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় মিছিল। সবাই মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ব্যারাকের দিকে ছুটছে। ছত্রভঙ্গ মিছিলের মাঝখানে এক যুবক, একা, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ওর হাতে প্ল্যাকার্ড, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। সে কিছুতেই পিছু হটবে না। বাংলা ভাষার দাবি পিছু হটতে পারে না। বুলেট ছুটে আসছে, যুবক এগিয়ে যাচ্ছে। কণ্ঠে তাঁর স্লোগান। 'রাষ্ট্রভাষা রাষ্ট্রভাষা/বাংলা চাই বাংলা চাই'। একটি নির্মম বুলেট ছুটে এসে ঢুকে যায় ওর বুকে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে জব্বার

পুকুরের পূর্ব ধারের সিঁড়িতে জরুরি গোপন বৈঠকে বসলাম। এই বৈঠকে ১১ জন ছাত্রনেতা উপস্থিত ছিল।

- নামগুলো মনে আছে?

- থাকবো না কেন। মুখগুলি এখনও চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাই। গাজীউল হক, হাবিবুর রহমান শেলী, মোহাম্মদ সুলতান, জিল্লুর রহমান, আবদুল মোমিন, এস এ বারী এটি, সৈয়দ কমরুদ্দিন শহুদ, আনোয়ারুল হক খান, মঞ্জুর হোসেন, আনোয়ার হোসেন আর আমি।

- মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা শহরে ১১ জনের একটি টিম অপারেশন চালায়। ভাষা আন্দোলনেও আপনারা ১১ জন। ১১ সংখ্যাটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

- ভালো অবজারভেশন তোমার, এইটা তো ভাবি নাই।

- তারপর?

- সেই রাতেই ভাষা আন্দোলনের রূপরেখা ফাইনাল হয়ে যায়। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম সকালে, পুরনো কলাভবনের সামনে, আমতলার সভায় গাজীউল হক সভাপতিত্ব করবে। যদি এর আগেই ও গ্রেফতার হয়ে যায় তাইলে আমি সভাপতিত্ব করবো, যদি আমরা দুজনই গ্রেফতার হই তাইলে সভাপতিত্ব করবে কমরুদ্দিন শহুদ। শুরুতেই বক্তৃতা করবে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক আবদুল মতিন। গাজীউল হক সভাপতির বক্তব্যে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত জানিয়ে সভা শেষ করবে।

- হলোও কি তাই?

- একদম।

- পুলিশ কখন গুলি ছুড়লো?

- কইতাছি, খাড়াও।

তিনি উঠে দোকানের ক্যাশ কাউন্টারের কাছে যান। ওখানে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর নাম হুমায়ুন ফরিদী। তিনি হুমায়ুন ফরিদীর সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে তাঁকে পেছনে, আড্ডায় যোগ দিতে বলেন, ফরিদীর তাড়া থাকায় তিনি চলে যান। মুকুল ফিরে আসেন। আলোচনা আবার শুরু হয়। এরই মধ্যে চা নিয়ে আসে দোকানের একজন তরুণ কর্মচারী। এম এর আখতার মুকুলের পরনে হাফ হাতা সাদা শার্ট। তিনি চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বসতে বসতে বলেন,

- সেই মুহূর্তের বর্ণনা দিতে গেলে তো তখনকার পরিবেশের কথাও বলতে হয়। বিকাল তিনটা দশ মিনিট। ছায়ায় ঢাকা রমনা, পিচঢালা রাস্তার দুপাশে সারি সারি রক্তকরবী আর হিজলের সারি। এইরকম মনোরম পরিবেশে শুরু হল নারকীয় হত্যাকাণ্ড।

মেডিকেল হোস্টেলের রাস্তার উল্টো দিকের দোকানটির পেছন থেকে একদল সশস্ত্র পুলিশ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোরেশীর নির্দেশে যমদূতের মত দৌড়ে এসে ওয়ালী ফায়ার করলো। ঘটনাস্থলেই দুজন শহীদ হল আর আহত হল ৯৬ জন। আহতদের আর্তচিৎকারে দ্বিতীয় কারবালা হয়ে গেল জায়গাটি।

- তখন কি শুধু দুজন শহীদ হন?

- রফিক সাথে সাথেই মারা যায়, মেডিকেলে নেওয়ার পর বরকত। জব্বারও ওইদিনই শহীদ হয়। আহত সালাম পরে শহীদ হয়।

- এই চারজন কি আন্দোলনের সাথে ছিল?

- আন্দোলনে যোগ দিতেই তো এসেছিল, তবে এরা কেউ আন্দোলন পরিকল্পনায় বা আগের কোনো মিটিং-মিছিলে ছিল না।

তিনি একটু থেমে খানিকটা ইতিহাস সচেতন হয়ে বলেন, কোনো মিছিলে ওরা কেউ যোগ দিয়ে থাকলে থাকতেও পারে; তবে আমার তা জানা নেই। ভাষা শহীদদের মধ্যে একমাত্র বরকতই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। ২৪ নম্বর বেডে শুয়ে আছেন রহিমা খাতুন, তাঁর বাঁ হাতে সেলাইনের সুঁই। তিনি ডান হাত তুলে জব্বারের মাথায় হাত বুলান। শাশুড়ির আশীর্বাদ নিতে মাথা নিচু করে এগিয়ে দেয় জব্বার। রহিমা খাতুন জব্বারের কপালে-গালে হাত বুলাতে বুলাতে বলেন, আমি আর বাঁচুম না বাবা। তুমি যেই কষ্ট করছ আমারে নিয়া, নিজের জান তামা কৈরা আমারে ডাহাত আনছ, আমি পাকপরওয়ারদেগারের কাছে তুমার নিগা দোয়া করি, আল্লা যেন তুমারে সুখে রাখে। আমেনার বয়স কম বাবা, তুমি হেরে নিজের হাতে গৈড়া নিবা।

জব্বার মাথা তোলে। তার হাতে এখনো অনেক কাজ বাকি। মাত্র তো সিট পাওয়া গেল। ডাক্তার প্রেসক্রিপশনও দিয়েছে, ওষুধ কিনতে হবে, শাশুড়ির খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। শক্ত কিছু খেলেই বমি করে দেয়। কিছু নরম ফল জোগাড় করতে হবে। নিজের থাকার বন্দোবস্তও করতে হবে। ছাত্র ব্যারাকে গফরগাঁওয়ের হুরমত আলী আছে, সে-ই ভরসা। তাঁর কাছে জায়গা না পেলে কোনো মসজিদে গিয়ে ঘুমাতে হবে।

হুরমত থাকে ২০ নম্বর ব্যারাকে। কপাল ভালো জব্বারের। হুরমতকে পাওয়া গেছে। এর আগে হুরমত জব্বারকে দেখেনি। এলাকার পরিচয় পেয়ে খুশি মনেই তাঁকে রাখতে রাজি হয়।

সারারাত ধরে মুসলিম লীগ সরকারের ১৪৪ ধারা আর ভাষা আন্দোলনের ধর্মঘট, মিছিল, এইসব নিয়ে আলোচনা হয় দুজনের মধ্যে। জব্বার পোড় খাওয়া মানুষ। দেশে দেশে ঘুরে বেরিয়েছে, শ্রমিকদের অধিকারের জন্য রেঙ্গুনে অনেক মিটিং-মিছিলে অংশ নিয়েছে। হঠাৎ জব্বার আনমনা হয়ে গেলে হুরমত বলে,

- থাইক ক্ষ্যামা দেই। আফনের মন খারাপ ঐছে। বেশি মন খারাপ করুইন্নাযে জব্বার বাই, বাংলা ভাষার দাবি থামানি যাইতো না।

- আবুডার কতা স্মরণে আসছে। বুকটা কেমুন ছ্যাঁত কৈরা উডে।

- লন গুমাই। কাইল মিছিলো যাইবাইন?

- দেহি, আমার শাশুড়ির শৈলডা বেশি খারাপ।

- ঐছে কি?

- অহনও ধরতো ফারে নাই। কিছু ফরীক্কা নিরীক্কা করন লাগবো।

জব্বার যখন হাসপাতালে ঢোকে তখন কয়েকশ ছাত্র জড়ো হয়ে চুপচাপ অবস্থান নিয়েছে মেডিকেলের গেটে। মানুষগুলোর চোখে মুখে স্বপ্ন। মায়ের ভাষা থাকবে না, কথা বলবো উর্দুতে? না, তা হবে না। কি দৃঢ় প্রত্যয়। দরকার হলে জীবন দিতেও ওরা প্রস্তুত।

বেলা বাড়ার সাথে সাথে বক্তৃতা, স্লোগান আর পুলিশের সাথে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ায় এলাকা সরগরম। একটু পর পর জব্বার বাইরে এসে দেখে যায়। মনে পড়ে যায় রেঙ্গুনের কথা। একজন বাঙালি শ্রমিককে অন্যায়ভাবে ছাঁটাই করা হয়েছিল স্থানীয় বৌদ্ধদের ষড়যন্ত্রের কারণে। প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল ওরা। উত্তেজনায় তেঁতে উঠেছিল সব বাঙালি শ্রমিক। এখানেও পরিস্থিতি তেঁতে উঠছে। জব্বার নিজেও উত্তেজনা অনুভব করে। কে যেন ওর ভেতর থেকে বলে, যা জব্বার, মিছিলে যা। মায়ের ভাষাকে রক্ষা কর। ডাক্তার এসে জানায়, 'আরো কিছু ওষুধ লাগবে। বাইরে গণ্ডগোল হচ্ছে। সন্ধ্যার দিকে গিয়ে ওষুধগুলো নিয়ে আসবেন।'

তখন তিনটা বাজে। জব্বার আর অপেক্ষা করতে পারছে না। প্রেসক্রিপশনটা পকেটে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে আসে। বারান্দায় এপ্রোন পরা নার্সরা দাঁড়িয়ে থাকা পুরুষদের তিরস্কার করছে। 'মিছিলে যান, মিছিলে যান, বেরিয়ে পড়ুন'। এরই মধ্যে মিছিল বের হচ্ছে। একের পর এক মিছিল। ১৪৪ ধারা ভাঙছে ছাত্রজনতা। হাজার হাজার মানুষ এসে জড়ো হয়েছে। জব্বার ছুটে এসে মিছিলের মধ্যে ঢুকে যায়। ওর হাতে প্ল্যাকার্ড। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে, একটি শেল এসে লাগে কালো, পাতলা, বড় বড় চোখ, এক ছাত্রনেতার গায়ে। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে যায় ক'জন ছাত্র। উপুর্যপরি টিয়ারশেল আর বন্দুকের গুলিতে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় মিছিল। সবাই মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ব্যারাকের দিকে ছুটছে। ছত্রভঙ্গ মিছিলের মাঝখানে এক যুবক, একা, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ওর হাতে প্ল্যাকার্ড, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। সে কিছুতেই পিছু হটবে না। বাংলা ভাষার দাবি পিছু হটতে পারে না। বুলেট ছুটে আসছে, যুবক এগিয়ে যাচ্ছে। কণ্ঠে তাঁর স্লোগান। 'রাষ্ট্রভাষা রাষ্ট্রভাষা/বাংলা চাই বাংলা চাই'। একটি নির্মম বুলেট ছুটে এসে ঢুকে যায় ওর বুকে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে জব্বার। ওর দুই হাতের মাঝখানে প্ল্যাকার্ডের বাঁশের দণ্ড, তখনো উঁচুতে তুলে ধরে আছে রাষ্ট্রভাষার দাবি।

এরপর মুসলিম লীগ সরকারের বন্দুকের নল থেকে আরো বুলেট আসে, দলগতভাবে গুলি ছুড়ছে পুলিশ। যেন লক্ষ্যই ছাত্রদের বুক ঝাঁঝরা করে দেওয়া, বাংলা ভাষার বুক ঝাঁঝরা করে দেওয়া। অগণিত ছাত্রজনতা গুলিবিদ্ধ হয়। কয়েকজন ছাত্র ধরাধরি করে জব্বারকে নিয়ে যায় মেডিকেল কলেজের ইমার্জেন্সিতে। ডাক্তার তাঁকে মৃত ঘোষণা করে।

সবাই যখন প্রভাতফেরির মিছিলে, নগ্ন পায়ে সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে যাচ্ছে শহীদ মিনারের দিকে, তখন এক অশীতিপর বৃদ্ধা আজিমপুর কবরস্থানে এক মুঠো শুভ্র জুঁই ফুল ছড়িয়ে দেয় ভাষা শহীদ জব্বারের কবরে।